দুই হত্যাকাণ্ডের অভিন্ন যোগসূত্র!

সাম্প্রতিক প্রসঙ্গ | ইশফাক ইলাহী চৌধুরী

নিরাপত্তা বিশ্লেষক; অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমডোর

রাজধানী ঢাকার 'ডিপ্লোম্যাটিক জোনে' ইতালীয় নাগরিক সিজার তাভেলার হত্যাকাণ্ডের তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হতে না হতেই, বা বলা চলে রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতেই পাঁচ দিনের মাথায় রংপুর শহরের উপকণ্ঠে গ্রামীণ এলাকায় কর্মরত জাপানি নাগরিক হোশি কোনিওর হত্যাকাণ্ড নাগরিকদের উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত না করে পারে না। ইতালীয় নাগরিক যখন নিহত হলেন তখন অনেকেরই এটা ধরে নেওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে থাকতে পারে কোনো ব্যক্তিগত বিষয়। অর্থসংক্রান্ত লেনদেন বা আর্থিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ও হতে পারে। এমনকি তিনি 'রঙ টার্গেট' বা ভুল নিশানারও শিকার হতে পারেন। আমাদের দেশে এমন ঘটনা বিরল নয় যে, একজনকে হত্যা করতে গিয়ে আরেকজনকে হত্যা করা হয়েছে। বিশেষত আততায়ী যদি দেশীয় হয় এবং নিশানায় থাকা ব্যক্তি যদি বিদেশি হয়, তাহলে এমন ভুলের আশঙ্কা থেকেই যায়। আবার সিজার তাভেলা নিহত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আইএসের দায় স্বীকার এবং সেটা যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক একটি জঙ্গি তথ্য পর্যবেক্ষণ সংস্থার নজরে আসার বিষয়টিও অনেকের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়নি। কিন্তু রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়ার পর এগুলোকে আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে ধরে নেওয়ার উপায় নেই।

দুটি হত্যাকাণ্ডের মধ্যেই বেশকিছু বিষয়ে স্পষ্ট মিল রয়েছে। প্রথমত, এখন পর্যন্ত রংপুরে জাপানি নাগরিক হত্যাকাণ্ডের পর সংবাদমাধ্যমে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনামতে জানা যাচ্ছে, ঘাতকরা ছিল মুখোশধারী। ইতালীয় নাগরিকের ক্ষেত্রেও হত্যাকারীরা মুখোশধারী ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, উভয় ক্ষেত্রেই আততায়ী এসেছিল মোটরসাইকেলে করে। তৃতীয়ত, নিহত দুই বিদেশি নাগরিকই উন্নয়নকর্মী, তারা বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন উন্নয়ন প্রকল্পের সূত্র ধরে। চতুর্থত, ইতালি ও জাপান দুই দেশই বৈশ্বিক নিরাপত্তা ইস্যুতে ততটা সক্রিয় নয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, চীন বা রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের তুলনায় এই দুই দেশের পররাষ্ট্রনীতি সর্বত শান্তিপ্রিয়ই বলা চলে। এই চারটি মিল নিশ্চয়ই অনেকেরই চোখে পড়েছে। দুই হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে পঞ্চম যে সাদৃশ্য আমার চোখ এড়িয়ে যায়নি, তা হচ্ছে দু'জনকেই খুব কাছ থেকে তিন রাউন্ড গুলি করে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে।

রংপুরে জাপানি নাগরিক হোশি কোনিও হত্যাকাণ্ডের পর এখন আমার সন্দেহ সামান্যই যে, আগে ঢাকায় ইতালির নাগরিক সিজার তাভেলার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এর অভিন্ন যোগসূত্র রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, কী সেই যোগসূত্র? কারা এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে? এর পেছনে কি কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী জড়িত? আমরা দেখেছি, একেক দফায় জঙ্গি সংগঠনগুলো একেক ধরনের নাশকতা বেছে নেয়। যেমন ২০০৪-০৫ সালের দিকে দেশের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো জনসমাবেশে বা গণজমায়েতে বোমা বা গ্রেনেড হামলা করত। তখন যেসব জঙ্গি তৎপরতা চলেছে, তার সবগুলোতেই প্রায় একই ধরনের হামলা হয়েছে। তারও আগে আমরা দেখেছিলাম, দেশের কয়েকটি প্রত্যন্ত এলাকায় জঙ্গি বাহিনী আফগান স্টাইলে এলাকায় প্রগতিশীল রাজনীতিবিরোধী শুদ্ধি অভিযান চালিয়েছে। গত দুই বছরে দেখা গেছে, বিভিন্ন নামে জঙ্গিগোষ্ঠী মুক্তমনা লেখকদের ওপর চাপাতি নিয়ে হামলা চালিয়েছে। একের পর এক একইভাবে উগ্রবাদীদের চাপাতির কোপে নিহত হয়েছেন অন্তত পাঁচজন ব্লগার। তাহলে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলো কি এবার বিদেশি নাগরিক হত্যায় নামল?

এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের পেছনে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিও যুক্ত কি-না, সতর্কতার সঙ্গে খতিয়ে দেখতে হবে।

> সতর্কতা, নজরদারি, গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি আমি দেখতে চাইব, এই দুই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে, অতীতে এ ধরনের যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেগুলোরও আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে বা আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধীরা ছাড়া পেলে একই ধরনের অপরাধের প্রবণতা আরও বাড়ে

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যানবাহনে আগুন দিয়ে নিরীহ যাত্রীদের হত্যা করা হয়েছিল মূলত মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে তুলে ঘরে বন্দি রাখার জন্য। এর মাধ্যমে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা প্রদানে সরকারের ব্যর্থতাও তুলে ধরার উদ্দেশ্য ছিল। এ ছাড়াও উদ্দেশ্য ছিল দেশকে অস্থিতিশীল দেখানো। বিদেশি নাগরিকদের হত্যা করে কি একই ধরনের উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা চলছে? ভাববার বিষয়।

এমনকি এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করে তোলার পেছনে যুদ্ধাপরাধীদের দোসরদেরও ভূমিকা থাকতে পারে। কয়েক দিন আগে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ থেকে দু'জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীর বিচার মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ হয়েছে। এতে তাদের মৃত্যুদণ্ড বহাল রয়েছে। এ বিষয়ে যারা সংক্ষুব্ধ, তারাও বিদেশি হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে অস্থিতিশীলতা তৈরি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের আশায় বসে থাকতে পারে।

পাঁচ দিনের মাথায় দুই বিদেশি হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যের কারণ যাই হোক না কেন, যারাই হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটিয়ে থাকুক না কেন; তাদের অভিন্ন লক্ষ্য যে দেশকে অস্থিতিশীল করা এবং বিদেশিদের কাছে বাংলাদেশকে একটি অনিরাপদ দেশ হিসেবে তুলে ধরা, আমার সন্দেহ নেই। আমরা দেখেছি, ইতিমধ্যে নিরাপত্তার অজুহাত তুলে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট ক্রিকেট টিম বাংলাদেশে তাদের সিরিজ সফর বাতিল করেছে। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ বাংলাদেশে অবস্থানরত তাদের নাগরিকদের নিরাপদে চলাচল করার জন্য বা ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করে সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করেছে। বিদেশি নাগরিকদের জন্য নির্ধারিত ক্লাবগুলোর কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তির জন্য এগুলো খুবই নেতিবাচক বার্তা।

কেবল ভাবমূর্তির জন্য নেতিবাচক নয়, এর সঙ্গে বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর ভবিষ্যৎও জড়িত। নিহত ইতালীয় নাগরিক খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে কর্মরত একটি বহুজাতিক সংস্থায় যুক্ত ছিলেন। তার মৃত্যুর পর স্বভাবতই ওই সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করার ক্ষেত্রে আগের স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়ে ফেলবে। এমনকি তারা যদি প্রকল্প স্থগিত করে বা গুটিয়ে দেশ থেকে চলে যায়, তাতেও খুব বেশি বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই। বিশেষত জাপানি উন্নয়ন সংস্থাগুলো স্বাধীনতার পর থেকেই বাংলাদেশে নিঃস্বার্থভাবে ও নিভৃতে কাজ করে চলছে। নিহত জাপানি নাগরিক হোশি কোনিও-ও রংপুরের একটি গ্রামে কীভাবে নিভৃতে গোখাদ্য উৎপাদনের মতো কাজে জড়িত ছিলেন, তার মৃত্যুর পর আমরা জানতে পারলাম। এখানেই শেষ নয়, জাপানের সরকার ও অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে আমাদের অনেকগুলো বড় বড় প্রকল্পের ভবিষ্যৎ জড়িত। জাপানি কারিগরি বিশেষজ্ঞদের অনেককে মাঠপর্যায়ের উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করতে হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে, অনেক প্রত্যন্ত এলাকায়; পিরোজপুর থেকে দিনাজপুর– চলাচল করতে হয়। রংপুরের হত্যাকাণ্ডের পর তাদের চলাচল অবশ্যই সীমিত হবে। এর প্রভাব প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি ও সম্প্রসারণে অবশ্যই পড়বে।

বিদেশিদের ওপর এ ধরনের হামলার আগাম তথ্য আমাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে না থাকাটা দুর্ভাগ্যজনক ও হতাশা উদ্রেককারী। বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যদি আগে থেকে জেনে নিরাপত্তা পরামর্শ জারি করতে পারে, দেশীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পারবে না কেন? কেবল আগাম তথ্য দিতে ব্যর্থতা নয়, ইতালীয় নাগরিক হত্যাকাণ্ডের পর পাঁচ দিন পেরিয়ে গেলেও তার নেপথ্য নায়কদের চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে দৃশ্যত কোনো অগ্রগতি না থাকাও হতাশাজনক। এটা স্পষ্ট যে, আমাদের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ ধরনের নাশকতার বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় দক্ষতা দেখাতে পারছে না।

আমি নিজে দেখলাম, ইতালীয় নাগরিক হত্যাকাণ্ডের পর গুলশান-বনানী-বারিধারা এলাকায় যানবাহন ও জনসাধারণের চলাচলের ওপর কড়াকাড়ি আরোপ করা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে বাস ও রিকশা থেকে সাধারণ যাত্রীদের নামিয়ে তল্লাশি করা হচ্ছে। প্রশ্ন হচ্ছে, খুনিরা কি এভাবে সাধারণ বাস ও রিকশায় যাতায়াত করবে? আর একটি এলাকায় খুন করে পরবর্তী মিশনও সেখানেই চালাবে– এটা খুবই কাঁচা ধারণা। দেখা যাচ্ছে, তারা প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঢাকায় ঘটিয়ে পরেরটি দেশের আরেক প্রান্ত রংপুরে ঘটিয়ে ফেলল। আমি মনে করি, বরং গোটা দেশেই সর্বোচ্চ মাত্রায় সতর্কতা জারি করা উচিত। নজরদারি বাড়ানো দরকার। বিশেষ করে সন্দেহভাজন বিভিন্ন গোষ্ঠীর সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে আগাম গোয়েন্দা তথ্য হাতে থাকতেই হবে।

সতর্কতা, নজরদারি, গোয়েন্দা তৎপরতা বাড়ানোর পাশাপাশি আমি দেখতে চাইব, এই দুই হত্যাকাণ্ডের তদন্ত কাজ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। একই সঙ্গে, অতীতে এ ধরনের যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, সেগুলোরও আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হবে। কারণ বিচার প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হলে বা আইনের ফাঁকফোকর দিয়ে অপরাধীরা ছাড়া পেলে একই ধরনের অপরাধের প্রবণতা আরও বাড়ে। প্রয়োজনে বিদেশি তদন্ত সংস্থার সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। বড় কথা, তদন্ত দলকে কাজ করতে দিতে হবে স্বাধীনভাবে এবং তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সব সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারা যাকে প্রয়োজন মনে করবে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে, যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করবে, সেখানে যেতে পারবে। দুই বিদেশি নাগরিকের হত্যাকারীদের আইনের আওতায় আনতেই হবে। কেবল হত্যাকারীদের শাস্তির প্রয়োজনে নয়, বরং এ ধরনের আরও হত্যাকাণ্ড রোধ করার স্বার্থেই।